নীরবতায় নিচ্ছিদ্র পথ

আহমদ রাজু

আমার সত্যি আফসোস হয়, তাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলি না! কেমন মেয়ে তুই বলতো? আমি বরাবরই জানতাম ঈশানকে ছাড়া তোর এক মুহূর্ত চলবে না। অথচ সেই তুই ছয় ছয়টা বছর পার করে দিলি তাকে ছাড়া! আমি কখনও কোনদিন আশা করিনি তোদের এই বিচ্ছেদ। অর্থিকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কথাগুলো বলল মহুয়া।
মহুয়া অর্থির বাল্যবন্ধু। শুধু বাল্যবন্ধু বললে ভুল হবে। একসাথে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করেছে। মাষ্টার্স শেষ করার পর মহুয়া বিয়ে করে স্বামীর সাথে চলে যায় কানাডায়। তারপরে অর্থির সাথে আর যোগাযোগ হয়নি।
মহুয়া গত সপ্তাহে দেশে এসেছে। অনেক কষ্টে পরিচিতি পুরোনো বান্ধবীদের মাধ্যমে অর্থির বর্তমান ঠিকানাটা নিয়ে চলে আসে অর্থির বাসায়। ছিমছাম গোছানো তিন রুমের বাসাটা যশোর শহরের এক কোনায়। যেখানে শহরের কোলাহল নেই অথচ সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ না। অর্থির সাথে সামান্য বাক্যালাপেই মহুয়া বুঝতে পারে তার জীবনে ঘটে যাওয়া অনাকাংখিত ঘটনাগুলো। অর্থির মুখ দেখেই প্রথমে তার অনুভব হয়েছিল কঠিন কিছু একটা হয়েছে। মুখ শুকনো না, মাথার চুল উষ্ক শুষ্ক না, আগোছালো জীবনের কোন চিহ্ন নেই বাড়িটাতে, তাহলে কেন এমন মনে হলো তা ভেবে পায় না মহুয়া। সামান্য সময় পার হতেই তার বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়।
-কেউ যদি আমাকে না বুঝে, আমার মনের এক ফোটাও মূল্য না দিয়ে দূরে চলে যায় তাহলে আমার কী করার আছে? কথাগুলো শেষ না হতেই অর্থির দু'চোখ ছলছল করে ওঠে। মহুয়ার বুকের ওপর মুখ গুঁজে বাচ্চাদের মতো অঝোরে কাঁদতে থাকে। মহুয়া তাকে থামানোর চেষ্টা করে। এই অর্থি, তুই কী পাগল হয়েছিস? কাঁদছিস কেন?
বুকের ওপর থেকে মুখ তুলে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। বলল- আমি কাঁদবো কেন? এখন কী আর কান্নার বয়স আছে? আর কার জন্যে চোখের জল ফেলবো নীরবে। সে আমার কে? যাকে আমি চিনতাম সে অনেক আগেই মরে গেছে বলে আবারো আঁচল দিয়ে চোখ মোছে সে।
-চুপ কর, বলছি চুপ কর। অনেকদিন পরে আসলাম। দুটো হেসে কথা বলবি, আর তুই কিনা কেঁদে কেঁদে নিজের বুকতো ভেজাচ্ছিস সাথে আমার বুকও ভিজিয়ে দিচ্ছিস।
-মহুয়া একটা কথা সত্যি করে বলতো, আমি কি খুব খারাপ? প্রশ্ন অর্থির।
-হঠাৎ এই কথা বলছিস কেন? তুই কেমন তাতো আমি ভালো করেই জানি। জানি বলেই তুই ছিলি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আজও তেমন আছিস।
-তাহলে আমার জীবনটা এমন হলো কেন? কী ক্ষতি করেছিলাম সৃষ্টিকর্তার? আমার সুখ দেখে জ্বলে-পুড়ে মরছিল সে। যার জন্যে কপালের সমস্ত সুখ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল!
-অমন কথা বলতে হয় না অর্থি। পাপ হয়। সৃষ্টিকর্তা মহান। তিনি যা করেন তা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যে।
-পাপ! কিসের পাপ? পাপই যদি হবে তাহলে এতদিন তার নমুনা পেতাম। ইচ্ছে করে কেউ কি কখনও পাপ করে? করে না। যা করে তা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতে করতে হয় এ আমার বিশ্বাস। বলল অর্থি।

মহুয়া অর্থির মাথায় হাত রেখে বলল- থামতো এবার। অনেক হয়েছে। খিদেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। কিছু খেতে দিবি কিনা বল? অনেকদিন পরে এলাম। তোর কাছ থেকে পাপ পুর্ণ্যরে হিসেব শুনতে আসিনি।
অর্থি চোখ আবারো আচঁল দিয়ে মুছে বলল, চল রান্না ঘরের দিকে যায়।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। আষাঢ় এসেছে রাত বারোটা এক মিনিটে। কাগজ কলমে আষাঢ় আসলেও আকাশে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি তখনও। বাতাসও কিছু বলে না। ঘুম আসেনা অর্থির। বিছানা ছেড়ে বারান্দার দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ বাড়ির সামনে একটি প্রাইভেটকারের হেডলাইট নজরে পড়ে তার। বোঝা যায় সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। হাত ঘড়ির দিকে চোখ রাখে সে। বারোটা বাইশ মিনিট। অফিস থেকে ঈশান বাসায় ফিরেছে। ইদানীং প্রায় ঈশান রাত করে বাসায় ফেরে। বরাবরই তার একই কথা- অফিসে কাজ ছিল। কি এমন কাজ যে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত করতে হয় এমন প্রশ্ন করলে কোন সদুত্তর দিতে পারে না সে। শুধু অর্থির কপালে আলতো করে চুমু দিয়ে বলে- যা কিছু করি না কেন তোমার ভালবাসায় সিক্ত হয়েই করি। ঈশানের এমন কথায় কথা বাড়ায় না অর্থি।
সেদিন বিকেল পাঁচটার কিছু পরে ঈশানের অফিসে ফোন করলে অফিসের পিয়ন জানায়- সেতো পাঁচটা বাজার অন্তত দশ মিনিট আগে অফিস থেকে বেরিয়েছে। এক ম্যাডাম এসেছিল অফিসে। যার কারণে জরুরী কিছু কাজ ফেলে তিনি বের হয়েছেন। বলল অফিসের পিয়ন রহমত মৃধা। মেয়েটি কে অর্থি জানতে চাইলে সে বলল, তাকে আমি চিনি না। তবে প্রায় প্রতিদিন ঐ ম্যাডাম আসলে স্যার তাকে নিয়ে থেকে বেরিয়ে পড়ে। অফিসের পিয়নের এমন কথায় অর্থির মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে সিডরের ন্যায়।
সেদিন বাড়ির সামনে প্রাইভেট কার দেখে উৎসুখ চোখে তাকিয়ে থাকে অর্থি বারান্দায় এক কোনায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ আগে বিদ্যুৎ চলে গেছে। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার। রাতের জোৎস্না সে অন্ধকারকে খুব বেশি ম্লান করতে পারে না। আলো-অন্ধকারের মাঝে অর্থি দেখতে পায় প্রাইভেটকার থেকে ধীর গতিতে নামে ঈশান। সাথে একটি মেয়ে। নামার পর যেমন করে অর্থির কপালে চুমু দেয় ঠিক তেমনভাবে মেয়েটির কপালে চুমু দেয় ঈশান।
ফুলের ওপর ভ্রমর বসার উদ্দেশ্য যেমন সবাই বোঝে তেমনি এত রাতে একজন যুবতীর আবেদনময়ী শরীরে একজন যুবকের স্পর্শ করার অর্থ বুঝতে বাকি থাকে না অর্থির। তাহলে অফিসের পিয়ন রহমত মৃধা চুল পরিমাণও মিথ্যা বলেনি। ঈশান বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার পর অর্থি মেয়েটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কোন রকম ভনিতা না করেই ঈশান বলে, তুমি যা দেখেছো তা ঠিকই দেখেছো।
-তাহলে আমি যা শুনেছি তাও.....।
অর্থির কথা শেষ করার আগে ঈশান বলে ওঠে, তুমি কি শুনেছো জানিনা। তবে সবচেয়ে সত্যি হচ্ছে সে তোমার চেয়ে যথেষ্ট সুন্দরী।
-তার মানে? তুমি কী বলতে চাচ্ছো স্পষ্ট করে বলো? বলল অর্থি। ইতিমধ্যে চোখ ছলছল করে ওঠে তার।
-শিক্ষিতদের সবকিছু এভাবে ভেঙ্গে বলার প্রয়োজন আছে কি?
-আছে কী নেই সেটা আমাকে শেখাতে এসোনা ঈশান। আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সবকিছু জানার অধিকার আছে নিশ্চই।
-অধিকার নেই তা বলছি না। তবে অনধিকার চর্চা করার কোন অধিকার নেই তোমার।
-আমার স্বামী অন্য একজন মেয়েকে নিয়ে রাত বেরাত ঘুরে বেড়াবে আর আমি সে সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তাকে কি অনধিকার চর্চা বলা হয়?

-হ্যাঁ হয়। উত্তেজিত হয়ে ওঠে ঈশান। শোন অর্থি, এ সংসারে থাকতে হলে আমার কথা শুনতে হবে। আর যদি তা না পারো তাহলে তোমার অনুকূলের জায়গায় চলে যেতে পারো।
অর্থি ঈশানের জামার কলার চেপে ধরে বলল, তুমি কী ভেবেছো, যা খুশি তাই করবে? কী পেয়েছো মেয়েদের তোমরা? যুগে যুগে এই তোমরা মেয়েদের ভোগ্য পণ্য হিসেবে দেখে এসেছো। কেন, কেন তোমরা আমাদের মানুষ ভাবতে পারো না? শব্দ করে কেঁদে ওঠে অর্থি। চোখের জল নাকের গোড়া দিয়ে চিবুক বেয়ে নাভি পর্যন্ত গড়িয়ে যায় যা স্পষ্ট বুঝতে পারে ঈশান।
ঈশানের সাথে একই ছাদের নিচে বসবাস করার ইচ্ছা মন থেকে উবে যায় অর্থির। তাছাড়া বিদ্রোহী মেয়ের মতো স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেবে এমন কোন ভাবনাও মনে আনে না সে। প্রচলিত আইন-আদালত আর যা-ই পারুক না কেন মন ফিরিয়ে দিতে পারে না। তবে কী করবে এখন? আত্মহত্যা করবে? নাকি বিভোর্স দিয়ে চলে যাবে বাপের বাড়ি? এমন কিছু কিছু ভাবনা যে তার মনের মধ্যে আসেনি তা নয়। সব ভাবনা চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় নীরবে নিভৃতে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আর কখনও এ মুখো হবে না।

সেদিন ছিল রবিবার। ঈশান অফিসে যাবার কিছু পরে একটা চিরকুট লিখে বিছানার ওপর ফেলে রেখে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে অর্থি। তার একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ছোটখাট চাকুরী একটা জোগাড় হয়ে যাবে, অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না। ঢাকা থেকে সোজা যশোর এসে তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে চাকুরীর সন্ধান করতে থাকে। ক'দিন পরে শহরের এক প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী পেলে আশার আলো চোখে মুখে ফুটে ওঠে অর্থির। এখন থেকে কারো দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে না এই ভেবে।
দেড় দু'মাস গড়াতে না গড়াতেই অর্থি সংবাদ পায় যার সাথে ঈশানের সম্পর্ক ছিল সেই মেয়েকে বিয়ে করে কানাডায় চলে গেছে। সংবাদটা শোনার পর দু'চোখ ভরে জল আসলেও তা সংবরণ করে নেয় অর্থি। ভাগ্যকে মেনে নিয়েই আগামী দিনের পথের দিকে চোখ রাখে সে।

অর্থির মুখে ঈশানের কথা অনেক শুনলেও তাকে কখনও দ্যাখেনি মহুয়া। অর্থির মুখে নামই শুনেছে শুধু। তার প্রশংসা, ভাললাগা-মন্দলাগা, স্বভাব ইত্যাদি।
-তুই তাহলে বস আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি। বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় অর্থি।
সুন্দর পরিপাটি ঘরের চার দেয়ালে চোখ বোলাতে থাকে মহুয়া। হঠাৎ পুব দেয়ালে টাঙ্গানো খয়েরী কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা বস্তুর দিকে চোখ যায় তার। কৌতুহলবসতঃ এগিয়ে যায় সেদিকে। হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে কাপড়টা সরাতেই চোখ আটকে যায় সেদিকে। ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি। ছবি দেখে বোঝা যায় অর্থির বিয়ের সময় তোলা। অন্তরঙ্গ একটি মুহূর্ত অর্থি আর তার স্বামী। কিন্তু.....। মহুয়া চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে দু'চোখ কচলাতে থাকে। সে ভুল দেখছে নাতো! তবে কী? না না, তা হবে কেন? নাদিম মাহমুদের সাথে অর্থির ছবি? তবে কী! নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে। হয়তো তার ভুলও হতে পারে। অর্থির সাথে কথা না বলে ফেরেস্তার মতো স্বামী সম্পর্কে কোন বাজে মন্তব্য করার পক্ষপাতী নয় মহুয়া।
মহুয়ার স্বামী নাদিম মাহমুদকে কোনদিন দেখেনি অর্থি। আর ঈশানকেও দেখার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি মহুয়ার। অর্থির কাছে ঈশানের গল্প শুনতে শুনতে তার মুখবায়ব মনের মাঝে একে রেখেছিল যার সাথে নাদিম মাহমুদের বিন্দুমাত্র মিল নেই।
মহুয়ার আকাশ পাতাল ভাবনাকে ছেদ করে দেয় পেছন থেকে অর্থির ডাক। তাকে ছবির দিকে তাকাতে দেখে অর্থি বলল, এই ছবিটাই আমার সম্বল। ঈশানের সাথে এই স্মৃতিটাকেই আঁকড়ে বেঁচে আছি।

নিজের ভাবনাকে আড়াল করে মহুয়া বলল- ছবিটাকে এভাবে ঢেকে রেখেছিস কেন?
-আমার সুখের স্মৃতিটা যাতে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে না যায় সেজন্যে লালপেড়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছি। বলল অর্থি।

-তোকে একটা প্রশ্ন করি? বলল মহুয়া

-বল, কী জানতে চাস।

-ঈশান এখন কোথায় আছে জানিস নাকি?

-শুনেছি বিয়ে করে কানাডা প্রবাসী হয়েছে।

-তোর সাথে পরে আর কোন যোগাযোগ করেনি?

-না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অর্থি।
-তোর শ্বশুর বাড়িটা কোথায় বলতো?
-অরজিন্যাল বাড়ি টাঙ্গাইলে। থাকতো ঢাকা মিরপুরের এগারো নম্বর সেক্টরে।
-টাঙ্গাইলের কথা শুনে নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হয় মহুয়ার।
-তোর শ্বশুরের নাম আসমত মৃধা।
-হ্যাঁ; কিন্তু তুই জানলি কেমন করে?
-তোর স্বামী একটা ওষুধ কোম্পানী উপ-পরিচালক ছিল?
-হ্যাঁ; চোখ কপালে তুলে উত্তর দেয় অর্থি। কিন্তু তুই এতসব জানলি কী করে? আমার যতদূর মনে পড়ে তোকে কোনদিন এসব কথা বলিনি।
-তুই ছাড়া কী আর আমার জানার কেউ নেই নাকি?
এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হয় না মহুয়ার। তার আর কিছু বোঝার প্রয়োজন নেই। নাদিম মাহমুদ নিজের নাম গোপন করে ঈশান সেজে অর্থিকে বিয়ে করে শেষে তাকে ফেলে মহুয়াকে বিয়ে করার বিষয় চলন্ত ট্রেনের মতো সত্য, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মহুয়ার কাছে। পৃথিবী নামক ছোট্ট গ্রহের সমস্ত ঘৃণা এসে ভর করে তার ওপর। ইচ্ছে হয় কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গীরীর জ্বালামুখ দিয়ে পাতাল গহ্বরে ঢুকে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বাতাসের সাথে। জীবন সংকটের এই সন্ধিক্ষণে এখন কী করা উচিত তা ভেবে পায়না মহুয়া। সবকিছু কী খুলে বলবে অর্থির কাছে? সেতো তাকে ভুল বুঝবে না? নাকি দু'টি জীবনের সর্বোচ্চ ভুলের সমস্ত দোষ মহুয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে?
মহুয়া নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। সমস্ত চিন্তা তার নিজের এই বিভৎস এবং ক্ষুদ্র আকাশের সজীব মেঘমালার সাথে বসবাস করার ক্ষণিক সুখটুকু বিলীন হবার ভয়। সে মানসিকতা পরিহার করার অদম্য ইচ্ছা নিস্তব্ধ নীরবতার। যা এতদিনে বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি। যাকে এতদিন ফেরেস্তার মতো জেনে এসেছে সে কিনা.....!
অর্থি আমি সত্যি তোর কপালের অনন্ত সুখ মুছে দিতে চাইনি। আমি যদি সামান্যতম বুঝতে পারতাম তাহলে তোর এত বড় সর্বনাশ হতে দিতাম না কিছুতেই। মনের ভেতর হৃদয় নামক যন্ত্রটা অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরায় মহুয়ার, অর্থি যার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারে না। এখন কী করা উচিৎ? অর্থির স্বামীকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবে? নাকি চরম বেঈমান নাদিম মাহমুদ নামক মুখোশ পরা ঈশানকে তার প্রাপ্যটা বুঝিয়ে দিতে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবে? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় নাদিম মাহমুদকে ডিভোর্স দিয়ে অর্থির মতো একাকিত্ব জীবনকে বেছে নেবার।
কিছুক্ষণ আগে কালবোশেখি ঝড় বয়ে গেছে যশোর শহরের ওপর দিয়ে। ছোট-বড় বাড়িঘর, গাছপালা ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করে এখন নিশ্চুপ। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। অথচ মহুয়ার হৃদয়ের মাঝে আজ যে ঝড় শুরু হয়েছে তা শেষ হবে না কোনদিন। চলতে থাকবে সে তার নিজস্ব গতিতে।

কিছুক্ষণ আগে চৌরাস্তা মসজিদ থেকে ভেসে এসেছে এষার নামাজের আজান। অর্থি ছাড়তে না চাইলেও একপ্রকার জোর করে ঢাকার উদ্দেশ্যে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয় মহুয়া। মাত্র দু'মিনিট হলো ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেছে। মুহূর্তে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে পুরো শহর। পিচ ঢালা কালো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটি রিক্সা এসে গাঁ ঘেঁসে দাঁড়ায়। বলল, আপা যাবেন?
-হ্যাঁ।
-কই যাবেন?
-টার্মিনাল।
-আচ্ছা; ওঠেন।
মহুয়া রিক্সায় উঠে যখন টার্মিনালের দিকে রওনা হয় তখন রাত নয়টা বিশ মিনিট।

বিশ্বাসে ভালবাসা

আহমদ রাজু

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে
আমাকে বিশ্বাসঘাতক হতেই হবে এমন নিশ্চয়তা
দিই কী করে বলো? আমিতো নিশ্চিত একটি
অন্ধকারের পথে পা বাড়িয়েছি যখন
তোমরা ঘুম থেকে ওঠোনি। এখনও মাঝে মাঝে
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দ্যাখো বাংলাদেশ আর বাঙালির।

তুমি বিশ্বাস করো
আমি কখনও কোনদিন ঘুমায়নি, জেগে জেগে
কলাপাতায় টিয়ারঙ এঁকেছি শুধু
যা তোমাদের খালি চোখ খুঁজে পায়না।